প্রশ্ন ২৬২ ঃ কিসের উপর ভিত্তি করে 'রেশমী রুমাল' আন্দোলন হয়েছিল এবং কত সনে? এর নেতৃত্ব ও দায়িত্ব কে গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ 'শায়খুল-হিন্দ' মাওলানা মাহমুদুল হাসান ভারতবর্ষকে ইংরেজের কবলমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা এবং কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন মুসলমানদের এক নাযুক সময়ে আফগানিস্তানের আহমদ শাহ আবদালীকে ডেকে এনে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে দস্যু মারাঠাদের স্পর্ধা খর্ব করে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে হযরত শায়খুল-হিন্দ আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে তুরস্ক, চীন, রাশিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শক্তির সহযোগিতায় ভারতের বুকে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং জনযুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে কাবুল প্রেরণ করেন। মাওলানা সিন্ধীর কঠোর পরিশ্রমের ফলে আফগানিস্তানে একটি 'প্রবাসী ভারত সরকার' কায়েম করা সম্ভব হয়। এ সরকারের দূতগণ তুরস্কের সাথে একটা গোপন সমঝোতায় উপনীত হন এবং অস্ত্র সংগ্রহের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। এ জরুরী খবর এবং হযরত শায়খুল হিন্দকে কালবিলম্ব না করে মক্কা শরীফে বসেই তুর্কী সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে অনুরোধ জানিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রেশমী কাপড়ের মধ্যে বিশেষ কৌশলে একটা গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন। পত্রটি শায়খ আবদুল হক নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে হযরত শায়খুল হিন্দের বিশিষ্ট কর্মী শায়খ আবদুর রহীমের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অন্য একটি পত্রে শায়খ আবদুর রহীমকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়, যেন পত্রটি নিয়ে তিনি স্বয়ং মক্কা শরীফ চলে যান এবং সেখানে অবস্থানরত হযরত শায়খুল হিন্দের হাতে এ পত্র পৌঁছে দেয়া হয়। পত্রের বাহক শায়খ আবদুল হক ছিলেন একজন নওমুসলিম এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। হযরত শায়খুল হিন্দের নির্দেশে যেসব ছাত্র ও যুবক ভারতবর্ষের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে হিজরত করেছিলেন, ইনিও ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে শায়খ আবদুল হক পত্রটি শায়খ আবদুর রহীমের হাতে না পৌছিয়ে কাবুলের স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আল্লাহ্ নেওয়াজ খান নামক সিন্ধুর একজন যুবনেতার পিতা খান বাহাদুর রব নেওয়াজ খানের হাতে দিয়ে দেন। এ খান বাহাদুর সাহেবের মাধ্যমেই পত্রটি পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল উডওয়ার্থের হাতে গিয়ে পৌছে। এভাবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে যায়। হযরত শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের এ অধ্যায়টি

ইতিহাসে 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে খ্যাত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল না, একটা সর্বাত্মক আন্দোলনের একটি অধ্যায় ছিল মাত্র। পত্রটি ১৯১৬ সনের ১৬ আগস্ট মুলতানে রব নেওয়াজ খানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্র সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের সি, আই, ডি রিপোর্টে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেটি নিম্নরূপ ঃ

তিন টুকরা রেশমী কাপড়ে লিখিত পত্রের সংখ্যা ছিল তিনটি। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে লেখা চোখে পড়তো না, উদ্দেশ্যহীন আঁকিবুকি মনে হতো। কিন্তু পানিতে ভিজানোর পর উর্দু ভাষায় লিখিত পত্রের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠতো। তিনটি পত্রের দু'টির মধ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর এবং একটির মধ্যে মনসুর আনসারীর দস্তখত ছিল।

প্রশ্ন ২৬৩ ঃ (ক) মাসিক মদীনার এপ্রিল সংখ্যায় দেখলাম, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদী ছিলেন অষ্টাদশ শতকের একজন বহু বিতর্কিত সংস্কারক। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, আবদুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসরণ ও অনুকরণ আমরা করতে পারি কি না?

(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)-এর সাথে সে সময়ের উক্ত আবদুল ওয়াহহাব নজদীর শরীয়তের দিক দিয়ে আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন পার্থক্য ছিল কি না?

উত্তর ঃ (ক) ইতিপূর্বেকার একাধিক প্রশ্নের জবাবে আমরা বারবার বলেছি যে, অষ্টাদশ শতকের আরবের সে সংস্কারকের নাম ছিল মুহাম্মদ তাঁর পিতার নাম আবদুল ওয়াহহাব। কিন্তু আপনারা সে ভদ্রলোককে ছেড়ে তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহহাবের অনুসরণ করতে চান কেন?

বর্তমান সউদী আরবের জনগণ এবং আশেপাশের কাতার, আরব আমীরাত, বাহরাইন ও কুয়েতের অধিকাংশ লোকজন সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের মতবাদ অনুসারী। বায়তুল্লাহ শরীফ এবং মদীনার মসজিদে নববীর ইমামগণ সে মতবাদের অনুসারীই নন, প্রচারকও । সে মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যেই মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সউদী আরবের আরো একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনেক সংস্থা কায়েম করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানেরও শত শত ছেলে লেখাপড়া করছে। অনেকে পাস করে এসে দেশে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এদেশের বহু বিজ্ঞ আলেমের গভীর যোগাযোগ রয়েছে।

সুতরাং আপনারাও যদি সে মতবাদের অনুসরণ করতে চান, তবে দোষের কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না।

(খ) উপমহাদেশের সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর ধর্মীয় মতবাদের সাথে সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর প্রচারিত মতবাদের বেশ পার্থক্য রয়েছে। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ফেকাহ্র ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী হাম্বলী ফেকাহ্ অনুসরণ করতেন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কোরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি আহ্কাম গ্রহণ করারও পক্ষপাতী ছিলেন। হযরত শহীদ তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে তরীকতপন্থী বা প্রচলিত পীরী-মুরীদী প্রথার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী তরীকতের পন্থাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন। এ দু'টি প্রধান মতভেদ ছাড়াও আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে এ দু'সংস্কারকের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল?

প্রশ্ন ২৬৪ ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কত সালে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? হত্যার নায়ক কে ছিল?

উত্তর ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ তারিখে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্ফোর্ড বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখার একটি আইন প্রণয়ন করে। এ কালাকানুনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের সর্বত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উক্ত সনের ১৩ এপিল তারিখে পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি প্রাচীরঘেরা ময়দানে এ নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে একটি বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসমাবেশটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনারেল ডায়ার নামক জনৈক বৃটিশ সেনা অধ্যক্ষ দুর্ধর্ষ শিখ ও গুর্খা সৈন্যসহ সমগ্র ময়দানটি ঘিরে ফেলেন। অতঃপর প্রাচীরবেষ্টিত ময়দানের একমাত্র তোরণটি বন্ধ করে দিয়ে নির্বিচারে নিরস্ত্র জনগণের উপর মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে ঘটনাস্থলেই এক হাজারেরও বেশী লোক নিহত এবং প্রায় দু'হাজার গুরুতর আহত হয়। এ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র উপমহাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার জেনারেল ডায়ারকে দেশে ফিরিয়ে নেয়। প্রকৃতপক্ষে এ নির্মম হত্যাকাণ্ডই এদেশবাসীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরই শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন ২৬৫ ঃ আমি রেজভী দলীয় একটি ছোট বইতে দেখতে পেলাম যে, উপমহাদেশের আযাদীর স্বপ্নদ্রষ্টা মুজাহিদে মিল্লাত হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ নাকি বালাকোটের রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সুন্নী মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারান। এ ব্যাপারে সত্য তথ্য জানতে চাই।

উত্তর ঃ সে ছোট পুস্তিকার লেখক তথাকথিত সুন্নী ভদ্রলোকের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। ইংরেজ এবং শিখদের তরফ থেকে নিয়োজিত কিছু লোকই ষড়যন্ত্র করে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদকে এবং হযরত ইসমাঈল শহীদকে হত্যা করেছিল। অন্যথায় সম্মুখ যুদ্ধে এ দু'বীর কেশরীকে পরাজিত করা সম্ভবপর ছিল না। পরে এসব লোকই নিজেদেরকে তথাকথিত সুন্নী নামে পরিচিত করে এবং ইংরেজের এনামভোগী হয়ে ইসলামের এ দু'মহান সন্তান ও তাঁদের পরিচালিত মোজাহেদ আন্দোলনের অনুসারী উলামাগণের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার এবং নানা উদ্ভট ফতোয়া প্রচার করতে থাকে। মোটকথা, আজকের এসব স্বঘোষিত সুন্নী ভদ্রলোকেরা ইংরেজদের জুতাচাটা দ্বীন-ঈমান বিক্রয়কারী যেসব জঘন্য বিশ্বাসঘাতকদের চেলাগিরী করেন, সেসব নরপিশাচদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই যে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য।

প্রমাণের জন্য দেখুন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রপৌত্র মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রচিত "সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ" গ্রন্থ।

প্রশ্ন ২৬৬ ঃ লংকা বিজয়ী হনুমানের বংশধরেরা এখনও পৃথিবীতে বেঁচে আছে কি না? যদি থাকে, কোথায় আছে? যদি না থাকে, তাহলে এই প্রজাতিটি কখন কিভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো?

উত্তর ঃ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। যদি তাই হতো, তবে বর্তমানের সোনার লংকা ছারখার করছে কারা? দিল্লীর বর্তমান রাম-লক্ষ্মণদের প্রেরিত আধুনিক হনুমানেরা নয় কি?

প্রশ্ন ২৬৭ ঃ আমরা এতটুকু জানি যে, সিলেটে সর্বপ্রথম হযরত শাহজালালই এসে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। যদি তাই হয়, তবে বুরহানুদ্দীন কার কাছ থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন? সে সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও কি মুসলমান ছিল? যদি থেকে থাকে তবে তারা কার দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদিতে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগে। কিছুদিন আগে বৃহত্তর রংপুর জেলার গাইবান্ধা এলাকার এক গ্রামে একটি মাটির টিবির নিচ

থেকে আবিষ্কৃত একখানা মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল হিজরী ৬৯ সনে। এরপর থেকে অন্তত কয়েকশ' বছর কাল সমগ্র বাংলায় আরব, পারস্য ও তুর্কিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ওলী-আওলিয়াগণ ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁরা স্থানে স্থানে খানকাহ নির্মাণ করে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষার তালীম দিয়েছেন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় খৃষ্টীয় ১২০১ সনে গাজী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে। তারও একশ' এক বছর পর ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহজালাল সিলহেট জয় করেন। হযরত শাহজালালের দ্বারা সিলহেট অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর অনেক আগেও সিলহেট অঞ্চলে বিভিন্ন প্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম প্রবেশ লাভ করেছিল। কিছু কিছু মুসলমান সে অঞ্চলে বাসও করতেন। হযরত শাহজালালের (রহঃ) মাধ্যমেই সিলহেট অঞ্চলে ইসলাম এসেছে, একথা ঠিক নয়। বরং তাঁর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং এতদঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২৬৮ ঃ এ উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির পতন কখন হতে শুরু হয়েছিল? এ পতন কাদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় মুসলমানদের ভাগ্যলিপিতে নেমে এসেছিল?

উত্তর ঃ উপমহাদেশে সুলতানী আমলের অবসান ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানদের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মোগল দরবারে আমীর, ওমারা, সেনাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট আমলাদের অধিকাংশই ছিলেন ইরান-তুরান থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী লোকজন। এদের মধ্যে আবার পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ইরান থেকে আগতরা বেশী প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের অধিকাংশই ছিল শিয়া মতাবলম্বী। শিয়ারা প্রকৃতিগতভাবেই ষড়যন্ত্রপ্রিয়। এদের কারণেই স্থানীয় মুসলমানগণ শাসন ক্ষমতায় কখনও উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব পায়নি। মুসলমানদের চেয়ে বরং এরা মারাঠা, রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ছিল বেশী উৎসাহী।

শেষ শক্তিমান মোগল সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর প্রশাসনকে জঞ্জালমুক্ত করে ইসলামী শরীয়তভিত্তিক একটি গণকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় একান্ন বছরের শাসনামলে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য পথে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু বিপুল ক্ষমতাধর আমীর-ওমারার একটানা ষড়যন্ত্রের মুখে তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর ইন্তেকালের পরপরই অযোধ্যা এবং সুবে বাংলার শিয়া শাসকরা দিল্লীর সার্বিক কর্তৃত্ব থেকে

বের হয়ে আসে। এর ফলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে যায়। এ দুর্বলতার সুযোগেই ইংরেজ বেনিয়ারা প্রথমে বাংলা-বিহার এবং এর কিছুদিন পরই অযোধ্যাও দখল করে নেয়। দিল্লী দরবারের আমীর-ওমারা তখন সীমাহীন ভোগ-বিলাসে মত্ত এবং সুন্নী মুসলমানদের প্রাধান্য বিলুপ্ত করার ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত। মারাঠা, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি অমুসলিম শক্তিগুলো তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ষড়যন্ত্রকারী আমলাদের সহযোগিতায় বিদেশী ইংরেজদেরকে এদেশের শাসন কর্তৃত্বে ডেকে আনে।

উপমহাদেশে ইসলামী শক্তির এ পতনের ইতিহাস যেমন মর্মান্তিক, তেমনি সুদীর্ঘও বটে। প্রধানত পতন ত্বরান্বিত করেছিল মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ আমলার দায়িত্বহীনতা ও বেঈমানী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম রাজপুত, মারাঠা ও শিখ শক্তির ষড়যন্ত্র মুসলিম শাসনের নিষ্প্রাণ কাঠামোটির উপর শেষ আঘাত হেনেছিল মাত্র।

প্রশ্ন ২৬৯ ঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ ইংরেজ শাসনের আমলে এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী এদেশকে 'দারুল আমান' ঘোষণা করেন এবং হাজী সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে অন্যভাবে সংস্কার আন্দোলন চালান। তিনি নাকি ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার কথাও বলেন।

তাঁদের দু'জনের এ ভিন্নমত পোষণের কারণ কি?

উত্তর ঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ এবং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী উভয়ই ছিলেন বড় আলেম। জাতীয় ভিত্তিক যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে এজতেহাদ করা এবং শরীয়তসম্মত সমাধান দেয়ার যোগ্যতা উভয়ের ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ দিল্লীর শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর অভিমতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ইংরেজ কবলিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' মনে করতেন। দারুল হরবে ঈদ এবং জুমার নামায পড়া যায় না। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ছিলেন শাহ আবদুল আযীযের শাগরেদ এবং মোজাহেদ নেতা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) মুরীদ ও খলীফা। সুতরাং প্রথম অবস্থায় তিনিও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা দখলীকৃত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব'রূপেই গণ্য করতেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটে মোজাহেদ বাহিনীর পরাজয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের শোচনীয় ব্যর্থতার পর তিনি মত পরিবর্তন করেন। এ সময় তিনি অন্যান্য আরও কিছুসংখ্যক মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে এরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তখনকার পরিস্থিতিতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের পক্ষে যেহেতু সংঘাতের মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়ন

করা সম্ভবপর নয়, তাই সহযোগিতার ভিত্তিতেই অস্তিত্ব রক্ষা করা অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। মুসলিম সমাজের কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতেই যেহেতু মাওলানা জৌনপুরী এরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর এ অভিমতকে কোন অবস্থাতেই আমরা ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করতে পারি না। কোন বিজ্ঞ আলেম যখন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিতর্কিত কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন সেটাকে খারাপ চোখে দেখার অধিকার কারো নেই। তবে তাঁর সে সিদ্ধান্ত মানা বা না মানার অধিকার সবারই রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী এ উভয় বুযুর্গের পরস্পর বিরোধী দুই সিদ্ধান্তকেই আমরা স্ব স্ব স্থানে শুদ্ধ বলে মনে করি। কারণ, দু'জনেরই নিয়ত শুদ্ধ ছিল এবং দু'জনই উপমহাদেশের মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করতেন।

প্রশ্ন ২৭০ ঃ গাজী সুলতান সালাহউদ্দীনের দেশ কোথায়? কেউ বলে ফিলিস্তীনে, কেউ বলে ইরানের কুর্দিস্তানে।

উত্তর ঃ মহামতি গাজী সালাহউদ্দীনের দেশ ছিল কুর্দিস্তানে। তিনি খৃস্টান শক্তির কবল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সিকি শতাব্দীকাল ফিলিস্তীন, শাম ও মিসর এলাকায় খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। বীর কুর্দী জনগণকে বিচ্ছিন্ন ও হীনবল করার কুমতলবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা কুর্দিস্তানকে ইরান, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে বিভক্ত করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ২৭১ ঃ আপনার অনূদিত মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদীর রচিত 'আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭' পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় দিল্লীর যে বাদশাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই অকর্মা বাদশাহ্ এবং তার মূর্খ উযীরের নাম এবং বাদশাহর বেগমের নাম কি? উক্ত আন্দোলনে যেসব মোজাহেদ দিল্লীতে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের সেনানায়ক কে ছিলেন?

উত্তর ঃ দিল্লীর সেই বাদশাহের নাম বাহাদুর শাহ যফর, তাঁর স্ত্রীর নাম বেগম যীনাত মহল, উযীরের নাম মির্জা ইলাহী বখ্‌শ। মুজাহিদগণের নেতার নাম ছিল মাওলানা আহমদুল্লাহ্।

প্রশ্ন ২৭২ ঃ আধিপত্যবাদী রাশিয়ায় বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা কত? ধর্মকর্ম পালনে তাদের স্বাধীনতা কতটুকু, অর্থাৎ আমাদের মত ধর্মকর্ম পালনে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কি?

উত্তর ঃ ১৯১৭ সনে যখন কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়, তখন মধ্য এশিয়ায় ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটিরও অধিক। ১৯২৭ সন

পর্যন্ত মুসলমানগণ কিছুটা নিরাপদেই ছিলেন। এর পরই শুরু হয় ব্যাপক গণহত্যা। ফলে ৪২ সন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই কোটিতে। এখন পর্যন্তও সেই সংখ্যাই মোটামুটি বহাল আছে বলে জানা যায়। গত দশ বছরের মধ্যে রাশিয়া থেকে কোন মুসলমান হজ্জ করতে যাননি। নামায, রোযা করার অধিকার কতটুকু আছে তা বলা মুশকিল। অধিকাংশ মসজিদই হয় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে অথবা গুদাম কিংবা পশুশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমগ্র দেশে কোন দ্বীনী মাদরাসা নেই। বুখারার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মীরে-আরব মাদরাসাটিতে এখন মধ্য প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আরবী পড়ানো হয়। তবে এখানকার শিক্ষার্থী নির্বাচনের দায়িত্বও সরকারের। আরবী ভাষায় মুদ্রিত কোরআন শরীফ সমগ্র রাশিয়ায় অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু।

প্রশ্ন ২৭৩ ঃ ইতিপূর্বে উগাণ্ডার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইদি আমীন এবং উগাণ্ডা ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। কিভাবে সেটা খৃস্টানদের হাতে চলে গেল?

উত্তর ঃ মধ্য-আফ্রিকার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি খৃস্টানদের করতলগত। কারণ, বিগত প্রায় দু'শ' বছরের খৃস্টান আধিপত্যের ফলে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে খৃস্টানরা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে মুসলিম পরিচয় নিয়ে সেসব দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। উগাণ্ডাও তেমন একটি দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার ষাট ভাগেরও বেশী মুসলমান। ইদি আমীন ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সমগ্র খৃস্টানজগত তথা পাশ্চাত্য শক্তিগুলো এমন অপপ্রচারের তাণ্ডব সৃষ্টি করে যে, অনেক মুসলমান দেশ পর্যন্ত এ লোকটির প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। আসল ব্যাপারটা কি তা তলিয়ে দেখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি! শেষ পর্যন্ত খৃস্টানরা পার্শ্ববর্তী খৃস্টান শাসিত দেশের সহায়তায় ইদি আমীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। ক্ষমতা দখলকারী খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর এমন বীভৎস দমননীতি চালিয়েছে যে, বর্তমানে সে দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ বলতে কিছুই নেই। বিপুলসংখ্যক মুসলমান পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে আশ্রিত জীবন যাপন করছেন। ইদি আমীন দেশটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজের তরফ থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন ২৭৪ ঃ ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন শিয়া না সুন্নী?

উত্তর ঃ সুন্নী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

প্রশ্ন ২৭৫ ঃ একটি সাপ্তাহিকে দেখতে পেলাম, জর্দানের বাদশাহ হোসেনের ইঙ্গিতে নাকি ফিলিস্তীনীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে এবং মিসর থেকে ফিলিস্তীনীদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, এটা কি সত্য?

উত্তর ঃ এ তথ্য আংশিকভাবে সত্য। দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ ধরে নিজেদের ভিটামাটি থেকে দূরে ছিন্নমূল শিবির জীবন যাপন করে ফিলিস্তীনী জনগণের মধ্যে যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। এদের অনেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধে তাড়িত হয়ে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হয়ে পড়েছেন। ফলে, এরা কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্য শিবিরভুক্ত দেশসমূহ এবং সেসব দেশের শাসকশ্রেণীর প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় চরমপন্থী এসব ফিলিস্তীনীর এক দলকে এক সময় বাদশাহ হোসেন মারপিট করে তাঁর দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ফিলিস্তীনীদের বৃহত্তর আন্দোলনের সাথে জর্দানের বাদশাহ হোসেনের বিরোধ নেই এবং জর্দান সরকার ফিলিস্তীনী জনগণের হৃত আবাসভূমি ফিরে পাওয়ার সংগ্রামের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম এবং সাধ্যমত এ আন্দোলনকে সাহায্য সহায়তা দান করছেন। অপরদিকে আমেরিকার প্ররোচনায় মিসর যখন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো, তখন সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিল ফিলিস্তীনের ছিন্নমূল জনগণ।

তাঁরা তখন মিসরের সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন মিসর সরকার ভীত হয়ে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তীন জনগণকে মিসর থেকে বের করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২৭৬ ঃ আমেরিকার যে তিন ব্যক্তি চাঁদে পৌছেছিলেন, তাঁরা কি সেখানে ঘর বেঁধেছেন? তাঁদের মধ্যে কি কেউ মুসলমান হয়ে গেছেন?

উত্তর ঃ চাঁদের রহস্য আবিষ্কার করার লক্ষ্যে সরাসরি অভিযান শুরু হয় গত একযুগ ধরে। সর্বপ্রথম তিন আমেরিকান নভোচারী চাঁদে অবতরণ করে সেখানকার কিছু পাথর ও মাটি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এঁদের মধ্যে দু'জন পরে ইসলাম কবুল করেছেন। একজনের নাম কলিন্স এবং অপরজনের নাম নীল-আর্মস্ট্রং। এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা ইমপেক্ট-এ। পরে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আখতারুল আলম। এ সম্পর্কিত আর কোন বিস্তারিত তথ্য আমরা জানি না। তবে তাঁরা যে এখনো মুসলমান হিসেবেই জীবন যাপন করছেন এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তাঁদের

ইসলাম কবুল করার কারণ আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তা হচ্ছে, চাঁদে অবতরণ করার পর সেখানে তাঁরা অবিরাম একটা মধুর আওয়াজ শুনতে পান। পরে কায়রো সফরে এসে যখন তাঁরা চাঁদে শ্রুত আওয়াজের মত আওয়াজ মসজিদের মিনার থেকে উচ্চারিত হতে শুনেন, তখনই তাঁরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্রশ্ন ২৭৭ ঃ ইংরেজী কত সনে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করা হয়? সর্বপ্রথম কোন্ জাতির বসবাস হয় এবং তারা কোন্ দেশ থেকে আগত এবং কার উম্মত?

উত্তর ঃ বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। মানব জাতির সেই সূচনা যুগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। এ দেশেও বহু নবীর আগমন হয়েছে। পরবর্তীকালে দজলা-ফোরাতের দেশ থেকে বনী ইসরাঈলের একটা অংশও বর্তমান আফগানিস্তানের পথে এসে এদেশে বসতি স্থাপন করে। এদেরকেই আর্যজাতি বলে চিহ্নিত করা হয়। মোটকথা, মানুষের আবির্ভাবের প্রাথমিক যুগ থেকেই এদেশে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। ইংরেজী সন গণনার বয়স তো মাত্র উনিশশ' ছিয়াশি বছর। সুতরাং ইংরেজী কত সন থেকে এই উপমহাদেশে মানব বসতি শুরু হয়েছে, এ প্রশ্ন কত হাস্যকর তা চিন্তা করে দেখুন।

প্রশ্ন ২৭৮ ঃ 'ডাকযোগে কোরআন পাক প্রচারকেন্দ্র' সংস্থাটি কি ও কেন? কাদের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সাথে আহলে হক ওলামায়ে কেরামের কোন সুসম্পর্ক আছে কি না?

উত্তর ঃ আপনি যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা আমাদের নেই। তবে আল্লাহর বহু নেক বান্দা নানাভাবে আল্লাহর কালামের খেদমত করে আসছেন। পশ্চিম জার্মানীতে কিছুসংখ্যক উদ্যোগী মুসলমান কোরআন প্রচারের উদ্দেশ্যে একটা স্বতন্ত্র রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের দেশে যাঁরা ডাকযোগে কোরআন প্রচারের খেদমত করছেন, তাঁদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমরা চিনি। তাঁরা মুখলেস লোক বলেই আমাদের ধারণা।

প্রশ্ন ২৭৯ ঃ পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশে দু'একজন মুসলমানও বাস করে না? বর্তমানে সবচেয়ে কম মুসলমান কোন্ দেশে বাস করে?

উত্তর ঃ দুনিয়াতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে অন্তত কিছুসংখ্যক মুসলমান গিয়ে পৌছেননি। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ আমেরিকা এবং রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কম মুসলমান বাস করে বলে জানা যায়।

প্রশ্ন ২৮০ ঃ গাজী-কালু নামে কোন পীর-ফকীর ছিলেন কি? থাকলে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ গত শতকে মুন্সী আবদুর রহীম নামক একজন প্রথিতযশা লেখক 'গাজী-কালু-চাম্পাবতী' নামক একখানা জনপ্রিয় পুঁথি রচনা করেছিলেন। কোন কোন গবেষকের ধারণা, বাগেরহাটের প্রখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদের নির্মাতা ইসলাম প্রচারক হযরত খানজাহান আলীর গাজী এবং কালু নামক দু'জন শাগরেদের সুন্দরবন এলাকায় অসম সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড অবলম্বন করেই এই পুঁথি রচনা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ২৮১ ঃ আপনার দৃষ্টিতে আলীগড় কলেজের ফোয়ালারা কি ইসলামের সেবক হয়েছিলেন? তাঁদের দ্বারা ইসলামের উন্নতি হয়েছে, না অবনতি?

উত্তর ঃ আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল উপমহাদেশের অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে জাগতিক দিক থেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে। ইসলামের সেবার লক্ষ্য নিয়ে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্তগণের মূল্যায়ন করাই ঠিক নয়। তবে এই আলীগড়ই এমন কিছুসংখ্যক ইসলামের সেবক তৈরী করেছে, যাঁদের খেদমতকে মোটেও ছোট করে দেখার উপায় নেই। যেমন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, আকবর এলাহীবাদী প্রমুখ।

প্রশ্ন ২৮২ ঃ ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি মুসলিম দেশ ইরাক এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ কি? কখন থেকে এর সূচনা হয়? দেশ দু'টির কোন্‌টির প্রতি আপনার সমর্থন আছে এবং কেন?

উত্তর ঃ ইরাক এবং ইরানের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ শুরু হয়েছে বিগত ১৯৮০ সনের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে। প্রতিবেশী এ দু'টি দেশের মধ্যকার বিবাদ বহু প্রাচীন। অতীত ইতিহাসেও বারবার ইরানের শক্তিধর শাসকেরা ইরাক আক্রমণ করে আধিপত্য কায়েম করেছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ইরাকভূমি পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইরানীরা ইরাক ছেড়ে যায়। এরপর শাহ ইসমাঈলের শাসনামলে ইরানীরা ইরাক আক্রমণ করে ব্যাপক লুটপাট করে এবং দীর্ঘকাল দেশটি পদানত করে রাখে। ইরানের ক্ষমতাচ্যুত শাহ ইরাক-ইরানের মধ্যবর্তী নদী শাতিল-আরব প্রশ্নে ইরাকের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন এবং শাতিল আরবের মোহনায় জেগে উঠা দু'টি দ্বীপ দখল করে নেন। ইরাকের বর্তমান শাসকগণ দ্বীপ দু'টি উদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে ইরানের শাহ্‌ গদিচ্যুত হন এবং বর্তমান বিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন হন। এই সরকার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে বিপ্লবের মাধ্যমে ইরাকের বর্তমান শাসকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য

যে, ইরাকের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ শিয়া মতাবলম্বী এবং শিয়াদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলোর অধিকাংশই ইরাকে অবস্থিত। এ কারণে ইরানের বর্তমান ক্ষমতাসীন শিয়া ধর্ম-নেতাগণ ইরাককে পদানত করে তাদের ধর্মস্থানগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সীমান্ত সংঘর্ষসহ দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরনের নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করে দেন। ইরাক আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পেরে আগেভাগেই যুদ্ধের সূচনা করে এ জটিল সমস্যাটির একটা আন্তর্জাতিক সমাধানের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমস্যাটির একটি আন্তর্জাতিক সমাধান বের করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু ইরাক আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিটি প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করলেও ইরান একতরফাভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অটুট থাকে। ইরানের এই অনমনীয় মনোভাবের দরুনই যুদ্ধের অবসান হচ্ছে না।

ইরাক-ইরান দু'টিই মুসলিম দেশ। এদের মধ্যকার যুদ্ধের ফলে উভয় দেশেরই জান-মালের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। এ যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দু'টি দেশই নয়, সমগ্র মুসলিম জাহানকেই সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ যুদ্ধর সুযোগ নিয়েই ইসরাঈল লেবানন দখল করে নিতে সাহসী হয়েছে, বাগদাদে অবস্থিত মুসলিম দুনিয়ার সর্ববৃহৎ আণবিক শক্তি কেন্দ্রটি বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করে দিতে সাহসী হয়েছে। এ যুদ্ধের খরচ বহন করতে গিয়েই মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি মুসলিম দেশ আজ অর্থনৈতিক মন্দার শিকারে পরিণত হয়েছে। সে কারণে মুসলিম দুনিয়ার প্রতিটি সচেতন মানুষের সাথে সাথে আমরাও চাই, অবিলম্বে এ আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ হোক। উভয় দেশ নিজেদের সমস্যাদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুক। একই কারণে বারবার আবেদন করার পরও যারা যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনায় বসতে সম্মত হচ্ছে না, তাদের প্রতি আমরাও ক্ষুব্ধ।

প্রশ্ন ২৮৩ ঃ ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে গত ১৪ এপ্রিল থেকে চার দিনব্যাপী বাগদাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী পপুলার কনফারেন্স সম্বন্ধে জানতে চাই। সম্মেলনে ফিলিস্তীন, লেবানন ও আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়েও নাকি আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু জ্বলন্ত আসাম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত করা হলে নাকি জনৈক মুসলমান কংগ্রেস নেতা মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত আসাম পরিস্থিতিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে আলোচনার বাইরে রাখেন। এটা কি সত্য?

উত্তর ঃ হাঁ! বাগদাদে অনুষ্ঠিত পপুলার ইসলামী সম্মেলনে আসামের মুসলিম গণহত্যার ব্যাপারটি জনৈক ভারতীয় আলেম জননেতার তীব্র প্রতিবাদের ফলে

উত্থাপিত এবং আলোচিত হতে পারেনি। এ ব্যাপারে কোন প্রস্তাবও গ্রহণ করা যায়নি। গত ১৪ এপ্রিল থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চার দিনব্যাপী বাগদাদে বিশ্বের পঞ্চাশটিরও বেশী দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং শীর্ষস্থানীয় আলেম এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে মুসলিম উম্মার সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী পর্যালোচনা এবং সমাধানের পথ-নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি গ্রহণ করা হয়!

প্রশ্ন ২৮৪ ঃ "মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুযুর" নামক বইটি পড়ে ইরানের একগুঁয়েমি এবং ইরাকের শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে আমাদের আগের ধারণা একেবারে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এতে শান্তি মিশনের অন্য কারো বক্তব্য বা মন্তব্য নেই বলে আমরা সন্দিহান। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ এ বইটি সম্পর্কে খোদ হাফেজ্জী হুযুরের মন্তব্য হচ্ছে– এতে একপেশে এবং উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। শান্তি মিশনে অন্য যারা ছিলেন, তাদের কারো কোন বক্তব্য এতে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। হাফেজ্জী হুযুরের খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবও এ বইয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। বইটি প্রত্যাহার করে বিশেষ একতরফের পক্ষে যে মতলবী প্রচারণা চালানো হয়েছে, তা সংশোধন করার জন্য কমিটির তরফ থেকে নির্দেশও দেয়া হয়েছিল বলে শোনা গেছে। খবরের কাগজে এ সংবাদ প্রকাশিতও হয়েছে। তারপর আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কি মন্তব্য করব? বিশেষতঃ বিষয়টা যখন এ দেশের সবচেয়ে শুদ্ধ ও হকপন্থী বলে কথিত বুযুর্গানে-দ্বীনের তরফ থেকে বিশেষ তৎপরতার সাথে ছড়ানো হচ্ছে, তখন আমাদের মত লোকের মন্তব্যে কি আসবে-যাবে? তবে শান্তি মিশনের একজন আংশিক শরীকদার হিসাবে বলতে পারি, বুযুর্গীর এত বড় ব্লাকমার্কেটিং আমার জীবনে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি।

প্রশ্ন ২৮৫ ঃ কোন মুসলিম দেশে যুদ্ধ বিমান বা যাত্রীবাহী বিমান কারখানা আছে কি? থাকলে কোন্ দেশে?

উত্তর ঃ আমাদের জানা মতে নেই।

প্রশ্ন ২৮৬ ঃ আপনার দৃষ্টিতে ইণ্ডিয়া দারুল হরব, না দারুল আমান? 'মুলুক মিল্লাত বাঁচাও' কবে কার নেতৃত্বে কেন হয়েছিল ও আন্দোলনের ফল কি হয়েছে, সংক্ষেপে জানতে চাই।

উত্তর ঃ যেকোন দেশ হয় দারুল ইসলাম হবে, না হয় দারুল হরব হবে। অবশ্য যেসব দেশ দারুল ইসলামের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ এবং মুসলমানদের জান-মালের হেফাযত এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার

সরকারীভাবে সংরক্ষণ করে–পরবর্তী যুগের ফেকাহবিদগণ সেসব দেশকে 'দারুল-আমান' বলে অভিহিত করেন। সে বিচারে বর্তমান ইণ্ডিয়া সন্দেহাতীতরূপে 'দারুল হরব– দারুল আমান নয়। 'মুলক ও মিল্লাত বাঁচাও' নামে একটি আন্দোলন কর্নেল শাহ নেওয়াজ, মাওলানা সৈয়দ আসআদ মাদানী প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর পরিণতি কি হয়েছে, সে সম্পর্কে আর কোন তথ্য আমরা জানতে পারিনি। সম্ভবত এটা সাময়িক একটা আন্দোলন ছিল। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের চোখ রাঙ্গানিতে তা স্তিমিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২৮৭ ঃ কয়েকদিন আগে এক প্রকার এশতেহার বের হয়েছিল যে, হিন্দুস্থানে নাকি নব্বই হাজার ছয় শত মুসলমানকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানো হয়েছে? এ কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমরা কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইনি। তবে হিন্দুস্থানে প্রতিদিনই কোন না কোন মুসলমানকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার জন্য জোর-জবরদস্তি এবং পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ২৮৮ ঃ আগস্ট '৮৬ সংখ্যা মদীনার সম্পাদকীয় কলামে উল্লেখ আছে যে, ভারতে সেনাবাহিনীর কোন বিভাগেই মুসলমানদের গ্রহণ করা হয় না। এ তথ্য কি ঠিক? এ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ আপনার পক্ষে আমাদের বক্তব্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার মত কি কারণ ঘটলো? ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন বিভাগেই মুসলমানদের উপস্থিতি নেই। এ অভিযোগ সে দেশের মুসলিম নাগরিকগণই অহরহ করছেন। ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন একজন মুসলিম অফিসারের নাম তো আমরাও কোন দিন শুনতে পাই না! সুতরাং আমাদের বক্তব্য ঠিক কি না, এর জবাব দেয়ার জন্য ভারত সরকারকেই বলুন না!

প্রশ্ন ২৮৯ ঃ বর্তমান পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে মুসলমান নেই?

উত্তর ঃ বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব নেই।

প্রশ্ন ২৯০ ঃ ঐতিহাসিক সাধক শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহঃ) কি সাধনা করার জন্য কোন সময় চট্টগ্রাম এসেছিলেন? এসে থাকলে তাঁর আস্তানা কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ অনেক তালাশ করেও আমরা কোন কিতাবে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাই নি।

প্রশ্ন ২৯১ ঃ উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করেছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল এবং যাঁরা এই দাবীকে সমর্থন করেননি, তাদেরই বা কি উদ্দেশ্য ছিল, জানতে চাই।

উত্তর ঃ দিল্লীর সম্রাট রাজর্ষী আলমগীর আওরঙ্গযেবের ইন্তেকালের পর মোগল সাম্রাজ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়ার পর থেকে উপমহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় মারাঠা এবং উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শিখদের অভ্যুত্থান ঘটে। এ উভয় শক্তিরই মূল লক্ষ্য ছিল এই দেশ থেকে মুসলিম শক্তির পরিপূর্ণ উচ্ছেদ। সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ আন্দোলন মুসলমানগণকে সম্ভাব্য সর্বনাশ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই উপমহাদেশের তিনটি ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী বিবাদের সুযোগ নিয়ে বিদেশী ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ভিনদেশী শোষক ইংরেজরা এ দেশবাসী বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বিবাদ জিইয়ে রেখেই নিরুপদ্রবে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটা প্রভাবশালী অংশ বিদেশী শত্রু ইংরেজ বিতাড়নের ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন।

অপরদিকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের অন্য এক অংশ মুসলমানদের প্রতি হিন্দু এবং শিখ নেতৃবৃন্দের অসহিষ্ণু হিংস্র মনোভাবের অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলশ্রুতি মুসলিম জনগণের পক্ষে সুখকর হবে না মনে করে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করেন। পরবর্তী ইতিহাস অবশ্য দ্বিতীয় দলের উপলব্ধিই যে অধিকতর বাস্তব ছিল, তা প্রমাণ করেছে। আজকের হিন্দু ভারতে মুসলমান এবং শিখ ধর্মাবলম্বীদের করুণ অবস্থা প্রমাণ করেছে যে, দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদমুক্ত হওয়ার সময় যদি মুসলিম নেতৃবৃন্দের সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী সমর্থন করতেন, তবে হয়ত মুসলিম জনগণের ভাগে কিছু বেশী এলাকা আসতো।

প্রশ্ন ২৯২ ঃ ১৯৪৭ ঈসায়ী সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতার পতাকা কে কোথায় সর্বপ্রথম উত্তোলন করেছিলেন?

উত্তর ঃ করাচীতে হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) এবং ঢাকায় হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ)।

প্রশ্ন ২৯৩ ঃ ভারতের নিহত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী মুসলমান ছিলেন বলে জানতাম। সম্প্রতি শুনলাম তিনি মুসলমান ছিলেন না। তাহলে তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তার জীবনী জানতে চাই।

উত্তর ঃ প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী পারসিক বা অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, মুসলমান ছিলেন না। ভদ্রলোক এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না, তাই তাঁর জীবনী লেখার গরজ কেউ অনুভব করেনি।

প্রশ্ন ২৯৪ ঃ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গায় যাঁদের প্রতি ফাঁসির হুকুম হয়, তাঁরা কে কে ছিলেন।

উত্তর ঃ মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী, মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী এবং মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজী। শেষোক্ত জন এখনও (এপ্রিল'৮৯) জীবিত রয়েছেন।

প্রশ্ন ২৯৫ ঃ বাংলাদেশে কোন ইহুদী আছে কি? যদি থাকে, তবে তাদের আস্তানা কোথায়?

উত্তর ঃ বাংলাদেশে কোন ইহুদী নাগরিক আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে ইহুদীদের আস্তানা প্রতি শহরেই রয়েছে। এদেশে ব্যবসারত অনেকগুলো বহুজাতিক কোম্পানী ইহুদীদের মালিকানাধীন। তাছাড়া রোটারী ক্লাব, লায়ন ক্লাব, রোটারেক্স, লিও ক্লাব, ফ্রী মিশন, বাহায়ী আন্দোলন, কাদিয়ানী আন্দোলন প্রভৃতি অনেকগুলো এমন সংগঠন রয়েছে, যেগুলো আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এদেশে সশরীরে ইহুদীদের উপস্থিতি না থাকলেও গোটা জাতির মন-মস্তিষ্ক এবং রগরেষার মধ্যে ইহুদীরা অত্যন্ত সুদৃঢ় আসন গেড়ে বসে রয়েছে।

প্রশ্ন ২৯৬ ঃ এই উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন বংশধর বসবাস করছেন কি না? থাকলে তাঁরা কারা, কোথায় কি অবস্থায় আছেন?

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) দুই পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইনের (রাঃ) আওলাদগণের মধ্যে অসংখ্য ওলী-দরবেশ এবং আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁরা আল্লাহর দ্বীন প্রচার করার লক্ষ্যেই দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই উপমহাদেশে এমনকি বাংলাদেশেও তাঁদের অনেকেই এসেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, বাংলাদেশে যেসব আলেম এবং ওলী-দরবেশ এসেছিলেন, তাঁদের কোন সঠিক ইতিহাস সংরক্ষিত হয়নি! হযরত শাহজালালের (রহঃ) সাথে আগত সৈয়দ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালার আওলাদে-রসূল ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর অধস্তন বংশধরগণ হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজারসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছেন। সাম্প্রতিককালে হযরত সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল-মাদানী সাহেব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১ সনে তিনি বিক্রমপুরের আবদুল্লাহপুর এলাকায় শহীদ হন। লালবাগ শাহী মসজিদ সংলগ্ন কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর আওলাদগণের কেউ কেউ ঢাকায় বসবাস করছেন। এ ছাড়াও আরো বহু বুযুর্গ এদেশে এসেছেন। তাঁদের বংশধর এদেশে আছেন, কিন্তু তাঁরা ধারাবাহিক কোন ইতিহাস সংরক্ষিত করতে পারেননি। ফলে, একথা আজ বলা মুশকিল যে, আওলাদে রসূলগণ এদেশের কোথায় কি অবস্থায় আছেন।

প্রশ্ন ২৯৭ ঃ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কখন কিভাবে কাদের দ্বারা ইসলাম প্রচার শুরু হয়? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট। একটি তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রাঃ) নেতৃত্বে চার জন সাহাবীর একটি জামাত রসূলুল্লাহর (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার আগেই হাবশা থেকে নৌপথে উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলস্থ চেরর রাজ্যে অবতরণ করেছিলেন। চেররে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁরা চীনের পথে বাংলার উপকূলে অবতরণ করে অন্যূন চার বছর এদেশে অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের প্রচারে এদেশে বহু লোক মুসলমান হয়েছিলেন। পরে এই জামাতটি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে ৬২৬ খৃষ্টাব্দে চীনের উপকূলীয় জনপদ ক্যান্টনে পৌঁছেন। এ তথ্য চীনা মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সে চারজন সাহাবী চীন দেশেই সমাহিত হয়েছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি লেখা মাত্র কয়েক মাস আগের মাসিক মদীনাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২৯৮ ঃ বাংলাদেশের বুকে হাদীস-কোরআনের চর্চা কবে ও কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল? কোন্ জায়গায় এবং কার উদ্যোগে প্রথমে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ ১২০১ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্তত তিনশ বছর আগে থেকেই এ দেশে বিশেষত উপকূলীয় এলাকা যথা চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সূফী-সাধক আলেমগণের উদ্যোগে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক যুগের প্রত্যেক প্রচারকই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোরআন-হাদীসসহ ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। আমাদের জানামতে চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম সোনারগাঁওয়ে হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বোখারী মাদরাসা স্থাপন করে বোখারী শরীফ শিক্ষাদান শুরু করেন। সে মাদরাসা থেকেই হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানিরী, হযরত বদরুদ্দীন যাহেদ, হযরত যইন ইরাকী, হযরত ইবরাহীম দানেশমন্দ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বহু আলেম তৈরি হন।

বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে, ঢাকা থেকে ১৮ মাইল পূর্বে মোগড়াপাড়া নামক স্থানে এখনো হযরত আবু তাওয়ামার মাদরাসার অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ২৯৯ ঃ আওলাদে রসূল (সাঃ) বর্তমানে আছেন কি? থাকলে কোন্ দেশে আছেন? আমাদের দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁরা নামের আগে 'সৈয়দ' লিখে থাকেন। সৈয়দ বংশের আগমন আমাদের দেশে কি ভাবে হয়েছিল?

উত্তর ঃ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর মাত্র এক পুত্র সন্তান আলী ইবনে হোসাইন যয়নুল আবেদীন জীবিত ছিলেন। তাঁর পুত্র

মুহাম্মদ বাকের, তাঁর পুত্র জাফর সাদেক এবং তাঁর পুত্র মূসা কাযেম অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম ও সাধক ছিলেন। হযরত ইমাম হাসানের আওলাদগণেরও বংশ বিস্তার লাভ করেছিল। হাসানী এবং হোসাইনী বংশের বুযুর্গ সদস্যগণ পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ বংশধারায় অনেক বড় বড় আলেম এবং ওলী-আওলিয়া জন্মগ্রহণ করেছেন। যেমন, বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম তিরমিযী, হযরত আবদুল কাদের জীলানী, হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী, হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখ। বাংলাদেশে হাসানী এবং হোসাইনী বংশের অনেক পীর-বুযুর্গের আগমন ঘটেছে। এঁদের মধ্যে হযরত নূর কুতবুল আলম, হযরত শাহজালালের সঙ্গীগণের মধ্যে সৈয়দ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালার প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের আওলাদগণের এদেশে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এসব বুযুর্গের আওলাদগণ প্রধানত নামের আগে সৈয়দ পদবী ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন ৩০০ ঃ শুনতে পাই যে, বাংলাদেশে মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ এককালে অমুসলমান ছিলেন। যদি তা সত্য হয়, তবে কখন হতে মুসলমানী শুরু হয় এবং কার দ্বারা?

উত্তর ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ এসে সমবেত হয়েছে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই যখন দিগ্বিজয়ী তাবেয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন সমুদ্র পথে বহুসংখ্যক আরব প্রচারক চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ ও আরাকান এলাকায় এসে উপনীত হন। এঁদের অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে ঘর সংসার করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। অপর দিকে হিজরী তৃতীয় শতকের দিকেই শাহ্ সুলতান রূমী, শাহ দৌলা, বাবা আদম শহীদ প্রমুখ বহু বুযুর্গ ব্যক্তি এদেশে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে আগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে খৃষ্টীয় ১২০১ সনে তুর্কী বীর বখতিয়ার খিলজী এসে বাংলাদেশের পশ্চিম এলাকা দখল করেন। তখন থেকেই মুসলমানদের প্রাধান্য এ দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের একশ' বছর পর আরব মোহাদ্দেস হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার আগমন ঘটে। তিনি বর্তমান ঢাকা শহরের কুড়ি মাইল পূর্বে সোনারগাঁওয়ে সর্বপ্রথম মাদরাসা কায়েম করেন। তারো অন্তত দেড়শ' বছর পর তিনশ' ষাট জন ওলী সাথে নিয়ে হযরত শাহ্জালাল (রহঃ)-এর আগমন ঘটে এবং মেঘনা নদীর পূর্ব পাড় থেকে আসামের কামরূপ রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে চলে আসে। পর্যায়ক্রমে বিজয় অভিযানের সাথে আগত আলেম-বুযুর্গ, সৈনিক, প্রশাসক, ব্যবসায়ী প্রমুখ বহু ধরনের লোক আরব, ইরান, তুরান থেকে এদেশে আগমন করেন এবং এদেশে তাঁদের বংশ বিস্তার হয়। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য

থেকেও বিপুল পরিমাণ লোক ইসলাম কবুল করে। এ ধরনের বিচিত্র জনগোষ্ঠীর সমাবেশেই আজকের বাংলাদেশের মুসলিম জনতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০১ : 'ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিব–কতটুকু সত্য? সত্য না হলে এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতাকাল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার জনাব আলহাজ্জ এ, টি, এম আবদুল মতিন কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট আলেম ও বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতায় "দারুল-উলূম ইসলামিক একাডেমী" নামে একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬১ সনে ফিল্ড মার্শাল মুঃ আয়ুব খান উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে অধিগ্রহণ করেন। অপরদিকে ষাটের দশকের একেবারে শুরুতে বিশিষ্ট অবাঙালী শিল্পপতি জনাব ইয়াহইয়া আহমদ বাওয়ানী প্রধানত কিছুসংখ্যক অবাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সহযোগিতায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও সংলগ্ন বিরাট মার্কেট কমপ্লেক্সটি গড়ে তোলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সনে শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী একাডেমী এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সটি একীভূত করে বর্তমান ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ৩০২ : জনৈক আলেমের মুখে শুনতে পেলাম যে, ঢাকার সোনারগাঁয়ে হযরত আল্লামা সিরাজ উদ্দীনের (রহঃ) মাযারের নিকট মাটির নিচে নাকি একটি লোহার ঘর আছে। প্রশ্ন হলো, সে ঘরটি কে তৈরি করেছেন এবং সে ঘরে কে থাকতেন?

উত্তর : এক সময়কার বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওর মোগড়াপাড়ায় হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ), হযরত ইবরাহীম দানেশমন্দ প্রমুখ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ওলী–আওলিয়ার মাযার রয়েছে। ঐ মাযারগুলোর নিকটে মাটির নিচে ইটের দ্বারা নির্মিত একটি হুজরা এখনও আছে। এই হুজরায় হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ) ইবাদত-বন্দেগী করতেন বলে জানা যায়।

প্রশ্ন ৩০৩ : মুসলিম রাষ্ট্র মালদ্বীপ কখন কিভাবে উদ্ভব হয় এবং স্বাধীন হয়? এ দেশটি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আমাদের দেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের নাম মালদ্বীপ। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগর বক্ষে ১০৭টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে। এর মধ্যে কোনটিরই আয়তন পাঁচ বর্গমাইলের বেশী নয়। মোট জনসংখ্যা মাত্র দেড় লক্ষের কিছু বেশী। রাজধানীর নাম মালে। জনগণের শতকরা একশত ভাগই মুসলমান। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বীপবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সে বছরই মরক্কো দেশীয় একজন দরবেশের আগমন হয় এবং তাঁর প্রভাবে দ্বীপের সমস্ত লোক একসাথে ইসলামে

দীক্ষিত হয়। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পুর্তগাল দেশটি দখল করে নেয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওরা দ্বীপে অবস্থান করে। এরপর থেকে নানা ঘটনাপ্রবাহ ও উত্থান-পতন অতিক্রম করে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশটি বৃটিশ আশ্রিত একজন সুলতান কর্তৃক শাসিত হতে থাকে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এটি স্বাধীন হয় এবং বর্তমানে জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য। প্রধানত মৎস্য শিকার ও পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল এ দেশটির অর্থনীতি দুর্বল। জনগণ ধর্মপরায়ণ। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল কাইয়ুম আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন বিদ্বান ব্যক্তি।

প্রশ্ন ৩০৪ : একটি পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে, তুরস্কে বোরকা পরার অপরাধে কিছুসংখ্যক স্কুল ছাত্রীকে গ্রেফতার ও দাড়ি রাখার দায়ে একজন স্কুল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সে দেশের মুসলমানদের পক্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের বোরকা পরার সরকারী অনুমোদন লাভের জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত হলে সরকার কর্তৃক তা বাতিল হয়ে যায়। এগুলো কতটুকু সত্য? এককালের তুর্কী ইসলামী খেলাফতের মুসলমানদের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ কি?

উত্তর : তুরস্কে ইসলামের আলো প্রবেশ করে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রাঃ) শাসনামলে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম উসমান তুর্কী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। পর্যায়ক্রমে আট জন সুলতান প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন বাগদাদ ও কায়রোর আব্বাসীয় খলীফাগণের সনদের ভিত্তিতে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান সলীম খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। এ বংশধারার ২৯ জন খলীফা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তুর্কী বীরেরাই সমগ্র পূর্ব ইউরোপ ইসলামী খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসেন। খৃষ্টান জগতের প্রধান শক্তিকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) দখল করে সেখানে খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্টান জগত এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং চিরকালের জন্য পাশ্চাত্য জগতকে ইসলামী অগ্রাভিযান থেকে সুরক্ষিত করে রাখার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সামনে নিয়ে ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ওদের ষড়যন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার ছিল নব্যশিক্ষিত একদল তুর্কী যুবকের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার মনোভঙ্গি সৃষ্টি করে দেয়া। উল্লিখিত শ্রেণীটির নেতৃত্ব প্রদান করে কামাল আতাতুর্ক নামক একজন পাশ্চাত্য অনুসারী সামরিক কর্মকর্তা। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পাশ্চাত্য শক্তির নিকট পরাজিত হয় এবং ইউরোপের সহযোগিতায় কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতা দখল করে। পাশ্চাত্যের ইঙ্গিতেই কামাল পাশা ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র তুরস্কের মুসলমানদেরকে ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে রাজনৈতিকভাবে বাধ্য করে। কামাল পাশা অন্যূন ত্রিশ হাজার আলেমকে হত্যা

করে। আরবী ভাষায় কোরআন পাঠ, নামাযে আরবী সূরা-কেরাত পাঠ করা, আযান দেয়া বেআইনী বলে ঘোষণা করে। মহিলাদের জন্য পর্দা করা এবং নারী-পুরুষ সবার জন্যই ইসলামী পোশাক পরিধান করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে। হজ্জ করা একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কামাল পাশা কর্তৃক প্রবর্তিত এ বিভীষিকাময় শাসনের স্টীমরোলার চলার পর হযরত শায়খ বদীউজ্জামান নুরসী (রহঃ) নামক আল্লাহর এক ওলীর প্রচেষ্টায় তুর্কীদের মধ্যে পুনরায় নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। তুর্কীরা আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন পাঠ ও হজ্জ করার অধিকার ফিরে পেয়েছে। কিন্তু তার পরও প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এখনও কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রভাব অবশিষ্ট রয়েছে। সে কারণেই ধর্মপ্রাণ তুর্কী জনগণকে এখনও দ্বীন–ধর্মের নিম্নতম অধিকারগুলোর জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। প্রবল শক্তিধর পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তিগুলো এখনও পর্যন্ত তুরস্কের একশ্রেণীর লোকের মন-মস্তিস্কের উপর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় সক্রিয়। এসব কারণেই প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন ৩০৫ ঃ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ সংগঠন মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনীর (রহঃ) নেতৃত্বে গান্ধী-নেহরুর কংগ্রেসে যোগ দেন। অপরপক্ষে মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেন। এখানে কাদের নেতৃত্ব সঠিক ছিল?

উত্তর ঃ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ গান্ধী ও নেহরুর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল এ তথ্য বিভ্রান্তিকর। আসলে এ সংগঠনটিই এ উপমহাদেশের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও বহু আগে এর প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেসের অনেক আগে এ সংগঠন উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিল। অবশ্য কংগ্রেসের ন্যায় জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দও দেশ বিভক্ত করার বিপক্ষে ছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, উপমহাদেশ বিভক্ত হলে মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটির জন্ম হবে, সেটিতে মুসলমানদের বৈষয়িক উন্নতি হবে সত্য, তবে ভারতে যে বিপুলসংখ্যক মুসলমান থেকে যাবে, তারা চিরকালের জন্য ধর্মান্ধ হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হবে। তাদের সে ধারণা কতটুকু যথার্থ ছিল, সে বিচার অবশ্য ভবিষ্যতের ইতিহাসই করবে। তবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব ধ্যান–ধারণা থাকতে পারে। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দেরও তেমনি নিজস্ব একটা ধ্যান-ধারণা ছিল। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ তখন ওনাদের সে মত গ্রহণ করেনি। ফলে, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেশ বিভাগ করে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে যেমন উপমহাদেশের দু'টি অঞ্চলের মুসলিম জনগণের প্রচুর কল্যাণ হয়েছে, তেমনি কোটি কোটি মুসলমানের চরম সর্বনাশও

হয়েছে। সেমতে আমাদের মূল্যায়নে তখনকার জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ভূমিকা ভ্রান্ত বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি, যাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাদের মূল্যায়নে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বক্তব্য নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে কোন্টা সঠিক ছিল, সেটা এক এক অঞ্চলের লোকদের বিবেচনায় এক এক রকম হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ৩০৬ ঃ মোতামার আল-আলম আল-ইসলামীর যে সম্মেলন পবিত্র মক্কায় ১৯২৬ খৃস্টাব্দে আহবান করা হয়েছিল, উক্ত সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে কোন্ কোন্ মনীষী অংশগ্রহণ করেছিলেন? সংগঠনটির বর্তমান সভাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানতে চাই।

উত্তর ঃ ১৯২৪ খৃস্টাব্দে পাশ্চাত্যের যৌথ ষড়যন্ত্রে খেলাফত উৎখাত হয়ে যাওয়ার পর তদানীন্তন মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট আলেম ও নেতৃবৃন্দ বিশ্ব মুসলিম জনগণের মধ্যে পারস্পরিক একটা যোগসূত্র কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ খৃস্টাব্দের হজ্জ মওসুমে পবিত্র মক্কা নগরীতে একটা বিশ্ব সম্মেলন আহবান করেছিলেন। সম্মেলনের মূল আহবায়ক ছিলেন ফিলিস্তীনের গ্রাণ্ড মুফতী সৈয়দ মুঃ আমীন আল-হোসাইনী। আমাদের এ উপমহাদেশ থেকে যোগদান করেছিলেন, আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী ও আল্লামা ইকবাল। মোতামারের বর্তমান সভাপতি ডঃ মারুফ দোয়ালিবী। ইনি দীর্ঘকাল সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি সউদী বাদশাহর শরীয়া বিষয়ক উপদেষ্টা।

প্রশ্ন ৩০৭ ঃ মোতামারে আলমে ইসলামী কার নেতৃত্বে, কবে, কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?

উত্তর ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফতের অবসান ঘোষণা করার পর ১৯২৬ খৃস্টাব্দে মক্কা শরীফে ফিলিস্তীনের মুফতী আমীনুল হোসাইনীর প্রচেষ্টায় এবং তদানীন্তন সউদী আরবের বাদশাহ আমীর আবদুল আযীযের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে 'মোতামার আল-আলম আল-ইসলামী' গঠিত হয়। সে সম্মেলনে তখনকার মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক খেলাফতের বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানদের একটা আন্তর্জাতিক সমিতি হিসাবে এ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। তখন থেকেই এ প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানদের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে আসছে। দুনিয়ার প্রত্যেক এলাকাতেই এ প্রতিষ্ঠানের শাখা এবং লোকজন রয়েছে।